Vol. 52 | No. 3 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিজ্ঞান : প্রসঙ্গ বিবর্তনবাদ

Volume	52
Issue	3
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সানাউল্লাহ আল-মুবীন
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i3.13
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i3.13
Pages	259-273
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিজ্ঞান : প্রসঙ্গ বিবর্তনবাদ

Check for updates

সানাউল্লাহ আল-মুবীন*

আধুনিক সভ্যতার প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে বিজ্ঞান (Science)। এর চর্চার মাধ্যমে মানুষ তার জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করে চলেছে সূক্ষ্মতম পরমাণুর (Atom) অভ্যন্তর থেকে শুরু করে মহাকাশের দূরতম সীমা পর্যন্ত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এর যে অভূতপূর্ব জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা তার চিন্তার জগৎকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে। জীববিজ্ঞান (Biology), পদার্থবিজ্ঞান (Physics), জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), বিশ্বতত্ত্ব (Cosmology) প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার পুরোনো ধারণা-বিশ্বাস ভেঙে তৈরি হয়েছে নতুন সব ধারণা। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস ডারউইন (Charles Darwin, ১৮০৯-১৮৮২) তাঁর সাড়া-জাগানো গ্রন্থ *প্রজাতির উৎপত্তি* (*The Origin of Species*) প্রকাশ করে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন,[১] আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein, ১৮৭৯-১৯৫৫) ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব[২] (Theory of Relativity) প্রচার করে বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের পূর্বেকার ধারণা সম্পূর্ণ পালটে দেন, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে এডউইন হাবল (Edwin Hubble, ১৮৮৯-১৯৫৩) দূরের গ্যালাক্সিগুলোর (Galaxy) আলোর বর্ণালিপি (Spectrum) বিশ্লেষণ করে দেখান যে, মহাবিশ্ব (Universe) ক্রমপ্রসারমাণ।[৩] আধুনিক বিজ্ঞানের এ সব বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও ধারণা বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৬১-১৯৪১) বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতায়, এবং অন্যান্য রচনায়, ব্যবহৃত হয়েছে নানা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, স্থান পেয়েছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব।

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল কৈশোরক দীক্ষা, শিক্ষা ও চর্চা। এবং এক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক প্রেরণাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তিনি রীতিমতো পড়াশোনা করেছেন বিজ্ঞান নিয়ে। পড়েছেন সারা জীবন বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছেন, পড়েছেন। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৮ : ৩৪০) বলেছেন : 'সাহিত্যের বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞানের বই আমি বেশি পড়ে থাকি। আমার রচনায় যদি এ অনুরাগ রূপ ধারণ করে তোমরা তার সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে না।' *বিশ্বপরিচয়* (১৩৪৪) গ্রন্থের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে তিনি (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ৫২১) লিখেছেন : 'জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। ... ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।' এই বৈজ্ঞানিক মেজাজের প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে তাঁর কবিতায়, নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে ও প্রবন্ধে। নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের প্রবেশ ঘটেছে সেখানে। রবীন্দ্ররচনার এমন কোনো শাখা নেই যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ স্থান পায়নি। সুব্রত বড়ুয়া (২০১১ : ৫৬) লিখেছেন :

---

* প্রভাষক, বাংলা, জরিনা-মফজল সিটি করপোরেশন কলেজ, চট্টগ্রাম।

> তাঁর নিজের স্বভাব, বোধ ও চিন্তার মধ্যে প্রথমাবধিই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা দৃঢ়মূল একটি জায়গা করে নিয়েছিল। সে কারণে তাঁর শিল্পদৃষ্টির বৈচিত্রের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছিল, যার সাক্ষ্য বহু রচনার পরতে পরতে বিজ্ঞানের ছায়াপাত।

তিনি (২০১১ : ৭২) আরও লিখেছেন : 'তাঁর নানা লেখায়ও তাই বিজ্ঞানচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসেবেই, আরোপিত অভিঘাত হিসেবে নয়।' এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ আল-মুতীর (১৯৮৭ : ২৭) মন্তব্যও স্মরণযোগ্য :

> বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই সহজাত অনুরাগের একটি ফল হয়েছে এই যে, তাঁর বিভিন্ন কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে ও নাটকে বৈজ্ঞানিক ভাব ও তত্ত্বের প্রবেশ ঘটেছে। তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে একটি বৈজ্ঞানিক মেজাজ যা তাঁর সাহিত্য রচনাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ... তাঁর কাব্যেও এক সজাগ বিজ্ঞানচেতনা এবং দর্শনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এক কথায় বিজ্ঞানের চেতনাকে কল্পনার রসে জারিত করে তাকে তিনি তাঁর সমগ্র রচনাসম্ভারে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে তিনটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মানুষের বিশ্ববীক্ষাকেই বদলে দিয়েছে। তত্ত্বগুলো হচ্ছে : ১. নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্ব, (The Law of Gravitation) ২. ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) ও ৩. আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব। এই তিনটি তত্ত্বই রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যাপকভাবে এসেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্ররচনায় বিবর্তনবাদের (কবির পরিভাষা 'অভিব্যক্তিবাদ') প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তা দেখার চেষ্টা করব।

১

অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের *পঞ্চভূত* (১৩০৪), *বিচিত্র প্রবন্ধ* (১৩১৪), *সাহিত্য* (১৩১৪), *ধর্ম* (১৩১৫) ও *শান্তিনিকেতন* (১৩১৫-১৩২১) — এই পাঁচটি প্রবন্ধগ্রন্থে অন্বিষ্ট হয়েছে বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গ।

পঞ্চভূত রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ। এর 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ', 'গদ্য ও পদ্য', 'ভদ্রতার আদর্শ' — এই তিনটি প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গ। প্রবন্ধগুলো কবির *সোনার তরী* (১৩০০) ও *চিত্রা* (১৩০২) কাব্যের কালপর্বে রচিত। বিজ্ঞানের এই মতবাদটি এ সময় কবিচিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার করেছিল। এই সময়েই রচিত হয় বিবর্তনবাদের চেতনাসমৃদ্ধ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'সন্ধ্যা' ও 'জীবনদেবতা'।

বিবর্তনের সূত্র সন্ধান করার জন্য ডারউইন ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত 'বিগল' (Beagle) নামে জাহাজে চড়ে দেশ থেকে দেশে, মহাদেশ থেকে মহাদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। বিগল জাহাজে তাঁর প্রকৃতিবিজ্ঞানীর পদটি ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক, বরং বিভিন্ন দেশ থেকে নানা জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করার জন্য তিনি যে সব লোক নিয়োগ করতেন তাদের বেতন শোধ করতেন তাঁর পিতা। বিগল-এর সফর শেষ করে সংগৃহীত তথ্যের ওপর দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে তিনি নোট লিখেছিলেন। তারপর আরও প্রায় এক যুগ পরিশ্রম করে সেই তথ্যরাজিকে তিনি একটি গ্রন্থের আকার

দিয়েছিলেন। অবশেষে ১৮৫৯ সালে বের হয় তাঁর সাড়াজাগানো গ্রন্থ *প্রজাতির উৎপত্তি*। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বদলে দিয়েছেন জীবজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের এতদিনকার লালিত বিশ্বাস। ডারউইন বলেছেন, পৃথিবীতে কোনো প্রজাতিই (species) একদিনে সৃষ্টি হয়নি; লাখ লাখ বছর ধরে একটি প্রাণরূপ থেকে অন্য একটি প্রাণরূপে অতি ধীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভবপ্রক্রিয়া। ১৮৭১ সালে ডারউইন প্রকাশ করেন তাঁর *মানুষের অবরোহণ* (*The Descent of Man*) গ্রন্থটি। এতে তিনি বলেছেন, দেহকাঠামোর দিক থেকে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী (Mammals), বিশেষ করে বানর জাতীয় প্রাণীদের (Ape — শিমপানজি, গরিলা প্রভৃতি) সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, এরা বিবর্তিত হয়েছে এক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকেই। এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি (Charles Darwin, 2004) স্পষ্ট করেই বলেছেন : কোনো এক সুদূর অতীতে পূর্ব গোলার্ধের বানরকুল থেকেই উদ্ভূত হয়েছে জগতের পরম বিস্ময় ও গৌরব — মানুষ। *পঞ্চভূত* গ্রন্থের 'ভদ্রতার আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ডারউইনের বিগলযাত্রা ও তাঁর প্রজাতির উৎপত্তি সম্পর্কিত উপসংহারকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> বৈরাগী ডারুয়িন সংসারের সহস্র চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রমাণ করিতেছিলেন যে, মানুষের আদিপুরুষ বানর ছিল। এই সমাচারটি আহরণ করিতে ডারুয়িনকে অনেক বৈরাগ্য সাধন করিতে হইয়াছিল। ['ভদ্রতার আদর্শ' : *পঞ্চভূত*]

ডারউইন অবশ্য প্রমাণ করে যেতে পারেননি, 'মানুষের আদিপুরুষ বানর ছিল'। তিনি কেবল প্রজাতির উৎপত্তি সম্পর্কিত তত্ত্ব খাড়া করেছেন, সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মানুষের জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪] এ সব জীবাশ্মের সাক্ষ্য তাঁর তত্ত্বকে নিঃসন্দেহে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে।

'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' প্রবন্ধে প্রাণীদের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু থেকে বুদ্ধিমান মানুষ পর্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে রবীন্দ্রনাথ সেটা স্বীকার করেছেন :

> জড় হইতে জন্তু এবং জন্তু হইতে মানুষ পর্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে এ কথা আমাদের কাছে অত্যদ্ভুত বোধ হয় না; কারণ বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্বে আমরা অন্তর হইতে এ কথা জানিয়াছিলাম। ['সৌন্দর্যের সম্বন্ধ': *পঞ্চভূত*]

ডারউইন বিবর্তনের তত্ত্ব প্রচার করেন *প্রজাতির উৎপত্তি* গ্রন্থে, ১৮৫৯ সালে, এবং তিনি মানুষকে এই তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন ১৮৭১ সালে, *মানুষের অবরোহণ* গ্রন্থে। কিন্তু মানুষ তার বহু আগেই নিজেকে স্থান দিয়েছিল শিমপানজি-গরিলাদের দলে : আঠারো শতকে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসকারী[৫] বিজ্ঞানীরা মানুষকে প্রাইমেট (Primate) বর্গভুক্ত করেছিলেন। এই বর্গে মানুষের পাশাপাশি আরও আছে শিমপানজি, গরিলা, ওরাং-ওটাং, বানর প্রভৃতি প্রাণী। এই শ্রেণিবিন্যাসের দিকে ইঙ্গিত করেই লেখক বলেছেন, 'বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্বে আমরা অন্তর হইতে এ কথা জানিয়াছিলাম।'

ডারউইন বলেছেন, বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় নৈসর্গিক নির্বাচনের (natural selection) মাধ্যমে। এজন্যে তিনি তাঁর *প্রজাতির উৎপত্তি* গ্রন্থের পুরো নাম দিয়েছেন

নৈসর্গিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি বা জীবনসংগ্রামে আনুকূল্যপ্রাপ্ত জাতিসমূহের স্থায়িত্ব (*The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*)। অর্থাৎ প্রজাতির উৎপত্তির ক্ষেত্রে মূল নিয়ামক হচ্ছে নিসর্গ। নিসর্গই নির্বাচন করে উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোন সদস্যটি তার আনুকূল্য পাবে এবং ক্রমবিকশিত হবে, অথবা আনুকূল্যের অভাবে কোন সদস্যটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজকের মতো এমন লম্বাগলা জিরাফ চিরকাল ছিল না। পুরো প্রজাতিটির মধ্যে হয়ত কোনো এক সময় একটি বা দুটি সদস্য কিছুটা লম্বা গলা নিয়েই জন্মেছিল। পরিবেশে টিকে থাকার সংগ্রামে এরাই নিসর্গের আনুকূল্য পেয়েছিল। কারণ চরম খাদ্যাভাবজনিত প্রচণ্ড নৈসর্গিক প্রতিকূলতায় অন্যদের তুলনায় এরা গাছের ওপরের ডাল থেকে পাতা খেতে পেরেছিল বেশি, শক্ত-সমর্থও হয়েছিল বেশি। সুতরাং এরা বংশধরও রেখে যেতে পেরেছিল বেশি। অন্যদিকে খাটোগলারা গাছের ওপরের ডাল থেকে পাতা খেতে পারেনি, লম্বাগলাদের মতো শক্ত-সমর্থও হতে পারেনি, সুতরাং এরা বংশধরও রেখে যায় অপেক্ষাকৃত কম। অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় এরা হেরে যায়। সুতরাং ক্রমেই এদের সংখ্যা কমে গেছে এবং একদিন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য জিরাফেরা নিসর্গের আনুকূল্য পেয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ক্রমবিকশিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত আজকের মতো এমন লম্বাগলা জিরাফে রূপান্তরিত হয়েছে।

গাছের ওপরের ডাল থেকে অধিক পাতা সংগ্রহ করার জন্য জিরাফের লম্বা গলার দরকার ছিল। কিন্তু ময়ূরের পেখম কেন ক্রমে প্রসারিত হয়েছে, অথচ ময়ূরীর কোনো পেখম নেই? ডারউইনের মতে, উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের বিকাশ হয় না। পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার জন্য ময়ূরীর পেখমের কোনোই প্রয়োজন নেই, কিন্তু ময়ূরীর মন পাওয়ার জন্য ময়ূরের পেখমের প্রয়োজন। ময়ূর যখন জৈবিক তাড়না অনুভব করে, তখন সে তার রং-বেরঙের পেখম খুলে দিয়ে ময়ূরীর চারপাশে নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে তার মন ভোলানোর চেষ্টা করে (Charles Darwin, 2004)। 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ডারউইনের নৈসর্গিক নির্বাচনের এই ব্যাখ্যাই যেন গ্রহণ করেছেন :

> বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলিয়া একটা তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। ... সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবেই ময়ূরীর কলাপের আবশ্যক হয় নাই, ময়ূরের পেখম ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে। ['গদ্য ও পদ্য' : *পঞ্চভূত*]

এককোষী প্রাণীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মানুষের আগমন, তার পক্ষে সভ্যতার নির্মাণ, ভাষার আবিষ্কার, কবিতারচনা, গ্রহ ও নক্ষত্রজগতে নভোযান প্রেরণ — মানুষের এ সকল বিস্ময়কর সাফল্যের দিকে ইঙ্গিত করে Carl Sagan (1985) বলেছেন, প্রায় পনেরো বিলিয়ন বছরের মহাজাগতিক বিবর্তনে হাইড্রোজেন (hydrogen) পরমাণুরা কী করতে পারে এগুলো তারই কিছু উদাহরণ। মহাবিশ্বের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ হাইড্রোজেনই তৈরি হয়ে গিয়েছিল সৃষ্টির প্রথম উষা — মহাবিস্ফোরণের (big bang) পরই। তারপর বহু কোটি বছর ধরে সেগুলো সংহত হয়েছে প্রথম প্রজন্মের নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিগুলোতে। তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বে সৃষ্টি হয়েছে প্রাণীর শরীর-গঠনকারী ভারী মৌলসমূহ

(heavy elements)। আসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের নক্ষত্রেরা। সৌরজগৎ (solar system) গঠনের সময় অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলসমূহ জড়ো হয় ভেতরের দিকের গ্রহগুলোতে : বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী ও মঙ্গলে (Mars)। তারপর একদিন পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে এক আশ্চর্য নিয়মে জড়পরমাণু সংহত হয়ে সৃষ্টি হয় জীবকোষ (biotic cell), আসে প্রাণ। প্রাণের সেই সরল রূপ কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তিত হয় জটিল থেকে জটিলতর রূপে। পৃথিবীতে আসে চেতনা ও প্রজ্ঞাবান এক প্রজাতি — মানুষ। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের 'পাগল' শীর্ষক প্রবন্ধে মানবসৃষ্টির সেই তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন :

> এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয় তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। ... এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্‌ভাবিত করিতেছেন। ['পাগল' : *বিচিত্র প্রবন্ধ*]

মানুষ মহাবিশ্বের সন্তান। মহাবিশ্বের সৃষ্টিশীল চরিত্রই এর উদ্‌ভাবক। সম্ভবত মহাবিশ্বের এই সৃষ্টিশীল চরিত্রটিকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে 'পাগল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য এটি তিনি ইতিবাচক অর্থে বলেছেন, এর সৃষ্টিশীলতায় মুগ্ধ হয়ে।

যে কার্যপদ্ধতিতে 'সরীসৃপের বংশে পাখি' এবং 'বানরের বংশে মানুষ' উদ্‌ভাবিত হয়, সে হলো বিবর্তন, অতি ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে এক ধরনের প্রাণরূপ থেকে অন্য এক ধরনের প্রাণরূপের বিকাশ। এ এক বিখ্যাত আবিষ্কার, যা ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। Carl Sagan (1985) বলেছেন, এটি এখন আর নিছক কোনো তত্ত্ব নয়, এক অনিবার্য সত্য। 'বসন্তযাপন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই বিবর্তনের সূত্রে গাছপালার সঙ্গে মানবজাতির দূর সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন, যা ডারউইনের আবিষ্কারের উপসংহার :

> অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোনো এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম, আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো এক আদিযুগে আমরা নিশ্চয় শাখী ছিলাম, ... তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মতো, মূঢ়ের মতো কাঁপিয়াছি; আমাদের সর্বাঙ্গ ঝর্‌ঝর্ মর্‌মর্ করিয়া পাগলের মতো গান গাহিয়াছে; আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি ডগা পর্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ['বসন্তযাপন' : *বিচিত্র প্রবন্ধ*]

রবীন্দ্রনাথের *সাহিত্য* গ্রন্থটিতে চারটি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। তার মধ্যে দুটো উল্লেখ ডারউইনের নৈসর্গিক নির্বাচন সংক্রান্ত। এর একটি 'সাহিত্যের সামগ্রী'তে। এখানে তিনি বলেছেন :

> প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে। ['সাহিত্যের সামগ্রী' : *সাহিত্য*]

অন্যটি 'সাহিত্যসৃষ্টি'তে :

> এই হইয়া উঠিবার চেষ্টা সফল হইলে তার পরে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টার পালা। কাঁঠালের গাছে উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল, কিন্তু যে ফলগুলা ছোটো ডালে ধরিয়াছে, যাহার বোঁটা নিতান্তই সরু, সেগুলা কোনোমতে কাঁঠাল-লীলা একটুখানি শুরু করিয়াই আবার অব্যক্তের মধ্যে অন্তর্ধান করে। ['সাহিত্যসৃষ্টি' : *সাহিত্য*]

ধর্ম গ্রন্থের 'স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> ডারউয়িনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব এই রণভূমিতে লড়াইয়ের তত্ত্ব — এখানে কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না, সকলেই সকলের চেয়ে বড়ো হইতে চায়। ['স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম' : *ধর্ম*]

চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ কেবল জীবজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিপ্লব ঘটায়নি, বদলে দিয়েছে মানুষের বিশ্ববীক্ষাকেও। 'একটি মন্ত্র' শীর্ষক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি স্মরণ করেছেন :

> বিজ্ঞানে যেমন অভিব্যক্তিবাদ — তাতে বলছে জগতে কোনো জিনিস একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয় নি, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠেছে। এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রটিকে মানুষ যতই সাধন ও মনন করছে ততই তার বিশ্ব-উপলব্ধি নানা দিকে বেড়ে চলেছে। ['একটি মন্ত্র' : *শান্তিনিকেতন*]

বস্তুত মানুষের নিজেকে আবিষ্কার করার জন্য এই মতবাদ ছিল এক আলোর ঝলকের মতো। টমাস হেনরি হাক্সলি (Thomas Henry Huxley, ১৮২৫-১৮৯৫) — যিনি এ মতবাদ জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন — বলেছেন, এই আলোর ঝলক অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলা কোনো মানুষের সামনে এমন এক পথ উন্মোচন করে দেয়, যা তাকে সরাসরি নিয়ে যেতে পারে তার বাড়িতে, অথবা না-ও নিতে পারে, তবে নিশ্চিতভাবেই এটি তাকে সোজা পথেই নেবে (Carl Sagan, 1985)।

২

রবীন্দ্রনাথের মাত্র একটি গল্পে বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সেটি *সে* (১৩৪৪) গ্রন্থের ১৩ সংখ্যক গল্প।[৬] এখানে দাদামশায় পুপেদিদির কাছে মাস্টারের গল্প বলেন। এই গল্প জড়পৃথিবীর বুকে প্রাণের বিকশিত হওয়ার গল্প, 'ধরার কঙ্কাল' সবুজ আস্তরণে ঢাকা পড়ার গল্প, ফুলফোটার গল্প, বিবর্তনের পথ বেয়ে মানুষের উদ্ভবের গল্প। এই গল্প 'ফুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার' পড়ে। তাই গল্পের এই বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গটি বুঝতে হলে আমাদের বিবর্তনবাদের দ্বারস্থ হতে হয়।

আমরা জেনেছি, সৃষ্টির পরে পৃথিবীর ইতিহাসের বহু কোটি বছর কেটে গেছে জড়-অবস্থায়। তারপর প্রাচীন পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে হঠাৎ একদিন দেখা দিল মহা-আশ্চর্য এক জীবকোষের (biotic cell) কণা। সেই জীবকোষ সূর্যের শক্তিকে আত্মসাৎ করে, নিজের অনুলিপি তৈরি করে, বহুগুণিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা সমুদ্রে, এক সময় উঠে এল ডাঙায়ও, পৃথিবীকে ঢেকে দিল শ্যামল আস্তরণে, বনাঞ্চল দাপিয়ে বেড়াল, কোটি কোটি বছরের

ব্যবধানে তারই বংশধর — ক্ষুদ্র একদল বৃক্ষজীবী নেমে এল মাটিতে, দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল, আগুন জ্বালাতে শিখল, হাতিয়ার বানাল, অন্য প্রাণীকে বশ করল, আবিষ্কার করল ভাষা, শিক্ষার জন্য স্কুল তৈরি করল, সভ্যতা গড়ল। বিবর্তনের এই দীর্ঘ ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে তুলে এনেছেন ছোটো একটি অনুচ্ছেদে :

> পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটামোটা ভারী ভারী জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আব্রুতা ছিল বহু যুগ ধরে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার যেন লজ্জা রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল স্তূপাকার হাড়-মাংসের বোঝাই নিয়ে; মোটা মোটা বর্ম পরে তারা দুশো পাঁচশো মোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুল্য গেল ঘুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ত্বকে। না রইল শিং, না রইল ক্ষুর, না রইল নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটিমাত্র পায়ে। [১৩ সংখ্যক গল্প : *সে*]

নরম মাটির 'পৃথিবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা' দেওয়া বলতে কবি এখানে সবুজ উদ্ভিদের পৃথিবীব্যাপী বিস্তারকে বুঝিয়েছেন। 'স্তূপাকার হাড়মাংসের বোঝাই নিয়ে' 'মোটা মোটা বর্ম' পরা 'দুশো পাঁচশো মোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে' বেড়ানো 'মাংসবাহীর দল' হচ্ছে বিশালকায় ডাইনোসর (dinosaur)। এরা ছিল সরীসৃপ (Reptiles) জাতীয় প্রাণী। বহু কোটি বছর এরা রাজত্ব করেছে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীতে শেষ ডাইনোসরটি বেঁচে ছিল আজ থেকে প্রায় ছয় কোটি বছর আগে। এদের বিলুপ্তি যেন সুগম করে দেয় স্তন্যপায়ীদের প্রতিষ্ঠার পথকে। এই স্তন্যপায়ীদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয় দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন আশ্চর্য মেধাবী এক প্রজাতি — মানুষ — জীবাশ্মের (fossil) সাক্ষ্য থেকে যে উদ্ধার করে নিয়েছে নিজের উদ্ভব ও বিকাশের গল্প।

এর সঙ্গে *স্ফুলিঙ্গের* (১৩৫২) একটি কবিতাও মিলিয়ে পড়া চলে :

> এসেছে প্রথম যুগে
> প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মাংসস্তূপ
> পঙ্কিল ধরণীপৃষ্ঠে।
> প্রাণের সে সন্দিগ্ধ স্বরূপ
> সৃষ্টির তিমির রাত্রে।
> ক্ষুদ্রতনু মানুষ তাহার
> মনের আনিল দীপ্তি।
> সংশয় ঘুচিল বিধাতার।
> [২৩ সংখ্যক কবিতা : *স্ফুলিঙ্গ*]

৩

রবীন্দ্রনাথের মাত্র একটি নাটকে বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সেটি *বিসর্জন* (১২৯৭)।

ডারউইনের মতে প্রকৃতিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর যে বিপুল সংখ্যক সদস্য জন্ম লাভ করে তার সব বেঁচে থাকে না, নৈসর্গিক পরিবেশের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করে তাদের টিকে থাকতে হয়। নিসর্গের আনুকূল্যপ্রাপ্ত যে সব সদস্য এই সংগ্রামে জয়ী হতে পারে তারাই টিকে থকে, বাকিরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ডারউইন এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন নৈসর্গিক নির্বাচন।

প্রাণিজগতে নৈসর্গিক নির্বাচন এক অমোঘ নিয়ামক। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছে কত প্রাণী! মূলত প্রাণীর পরিবেশ হচ্ছে তার জন্য এক ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্র, এই যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ্যতম প্রাণীটিই জয়ী হয়। প্রতিনিয়ত দুর্বল প্রাণী শিকার হয়ে যাচ্ছে সবল প্রাণীর। নৈসর্গিক নির্বাচন সংক্রান্ত তত্ত্বের এই দিকটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই নাটকের একটি দৃশ্যে। রঘুপতির সংলাপে অঙ্কিত হয়েছে প্রাণিজগতে জীবনসংগ্রামের এক ভয়াবহ ও রক্তাক্ত চিত্র :

এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট —
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর-জলে নির্মল আকাশে,
... ...
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন,
[দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য : *বিসর্জন*]

ডারউইনের নৈসর্গিক নির্বাচনের একটি প্রধান প্রসঙ্গ পরিবেশের মধ্যে প্রাণীর জীবনসংগ্রাম। এটা বর্ণনা করার জন্য খরচ হয়ে যাওয়ার কথা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। কিন্তু এখানে মাত্র কয়েকটি ছত্রের মধ্যে আঁকা হয়ে গেছে যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন[৭] (survival of the fittest) ও দুর্বলের উৎসাধনের বিভীষিকাময় চিত্র।

৪

রবীন্দ্রনাথের মোট পাঁচটি কবিতায় বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গ এসেছে। কবিতাগুলো হচ্ছে : *সোনার তরী*র 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা', *চিত্রা*র 'সন্ধ্যা' ও 'জীবনদেবতা' এবং *জন্মদিনে*র (১৩৪৮) ৫ সংখ্যক কবিতা।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কল্পনায় চলে গেছেন পৃথিবীর আদিম সমুদ্রের জঠরে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেখানেই একদিন প্রথম প্রাণের স্ফুরণ ঘটেছিল। এই সমুদ্র পৃথিবীকে সৌরজগতের মধ্যে এক অসাধারণ গ্রহে পরিণত করেছে। এর উপরিতলের চারভাগের প্রায় তিনভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে সমুদ্র। এই গ্রহটি সূর্য থেকে এমন ঠিক দূরত্বে রয়েছে যে, এর ফলে যে তাপ সে পায় তাতে এখানকার সাগর ও জলাশয়সমূহের পানি তরল অবস্থায় থাকে। সৌরজগতে আর একটিও এমন গ্রহ নেই, যেখানে তরল পানি রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই সমুদ্রের পানিতেই স্ফুরণ ঘটেছিল পৃথিবীর প্রথম প্রাণের (Carl Sagan, 1985; Stephen Hawking, 2001)। এ প্রসঙ্গে অমল দাশগুপ্ত (১৯৮৫ : ৫২) বলেছেন :

> সমুদ্র হচ্ছে প্রকৃতির রসায়নাগারে বিরাট একটি টেস্ট টিউব। সারা পৃথিবীর রাসায়নিক পদার্থগুলো এই টেস্ট টিউবে সংগৃহীত হয়ে চলে ও নানা বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অসংখ্য রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। এমনি অজস্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই প্রকৃতির রসায়নাগারের এই বিরাট টেস্ট টিউবে আজ থেকে সাড়ে-তিনশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর প্রথমতম প্রাণের উদ্ভব।

বহু কোটি বছরে সেই প্রাণ বিবর্তনের বহু জটিল ধাপ পেরিয়ে বিকশিত হয়েছে নানা ধারায়। সেই আদিম প্রাণ এক সময় সমুদ্র ছেড়ে উঠে আসে ডাঙায়, সৃষ্টি হয় উভচরদের (Amphibians), তারপরে আসে সরীসৃপরা, তারপরে স্তন্যপায়ীরা (Mammals)। এই স্তন্যপায়ীদের মধ্য থেকেই মানুষ নামে এমন এক আশ্চর্য মেধাবী প্রজাতির (species) উদ্ভব ঘটেছে, যারা সভ্যতা নির্মাণ করে, কবিতা লেখে, মহাবিশ্বকে জানার চেষ্টা করে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিসত্তার এক সময় সমুদ্রের 'বিরাট জঠরে' 'বিলীন' হয়ে থাকার কথা স্মরণ করছেন :

> ... মনে হয়, যেন মনে পড়ে
> যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
> অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
> ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
> মুদ্রিত হইয়া গেছে; ['সমুদ্রের প্রতি' : *সোনার তরী*]

'বসুন্ধরা' কবিতাটিও বিবর্তনবাদের চেতনায় সমৃদ্ধ। যে অন্তর্নাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধুলো (interstellar dust) ঘনীভূত হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, আজকের বিচিত্র প্রাণ এক সময় তার মধ্যেই নিহিত ছিল। কবির ব্যক্তিসত্তাও এক সময় লুকোনো ছিল পৃথিবীর মাটিতে, সমুদ্রের পানিতে, বনের সবুজ গাছের মাঝে কিংবা আকাশের নীলিমায়। কবিতাটিতে এই বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে আছে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘূর্ণন সংক্রান্ত কোপারনিকাসীয় মতবাদের প্রসঙ্গ :

> আমার পৃথিবী তুমি
> বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা-সনে
> আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
> অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ

সবিতৃমণ্ডল, ...
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়।
['বসুন্ধরা' : *সোনার তরী*]

এই কবিতাটি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী (১৩৯৬ : ৪) বলেছেন :

> [এটি] একটি অপূর্ব কবিতা। বিজ্ঞানের কোনো একটি মতবাদের সহিত সুসঙ্গত অথচ পরিপূর্ণভাবে কাব্য, এমন কবিতা প্রায় দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বকে জানিবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষার সহিত, অন্তঃপুরবাসিনী ধরিত্রীকে জড়াইয়া থাকিবার ব্যাকুল আগ্রহ টানা-পোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া বিচিত্র এক রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

'বিজ্ঞানের কোনো একটি মতবাদ' বলতে প্রমথনাথ বিশী এখানে বিবর্তনবাদের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কারণ এই কবিতায় কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিসত্তা এক সময় এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিল। তখন তাঁর বুকের ওপর সবুজ ঘাস উঠত, গাছের ফুল-ফল-পাতা ও গন্ধরেণু ঝরে পড়ত, ঝরে পড়ত শরতের সূর্যকিরণ; এর ফলে তাঁর দূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রতি লোমকূপ থেকে সুগন্ধ উত্তাপ বেরুত। তখন কবিচেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাস ও গাছের শিকড়ে শিকড়ে।

'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা'র সঙ্গে কবির *ছিন্নপত্রের* (১৩১৯) ৬৭ সংখ্যক পত্রটি এবং *গীতবিতানের* (১৩৩৮) 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' গানটির কয়েকটি পঙ্ক্তি মিলিয়ে পড়া যায়। স্মরণীয় *ছিন্নপত্রে* রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ :

> আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। ... তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, ... এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। ... তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। [রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৯ : ১৪৩-৪৪]

আর *গীতবিতানে* আছে :

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি — আহা
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।
[রবীন্দ্রনাথ, ১৪১২ : ৫৪৯]

উল্লিখিত চরণগুলো সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪০৬ : ৫৪৩) বলেছেন : "ইহাকে কবির জন্মান্তরবাদ-বিশ্বাস বলিলে ভুল হইবে; 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায় যে

(cosmic) বিশ্বাত্মবোধের কথা বলিয়াছিলেন, এ-ও সেই বৈজ্ঞানিক সত্য তথা দার্শনিক তত্ত্ব।" কোটি কোটি বছর আগে আদিম সমুদ্রে জন্ম নেওয়া প্রথম প্রাণসত্তা বিকশিত হয়েই আজকের এই সভ্য মানবজাতি, এবং সেই প্রাণসত্তার বিকাশ এখানেই শেষ নয়; বরং কোটি কোটি বছর পরের কোনো 'প্রভাতে'ও খেলা করবে সেই প্রাণসত্তা, অন্য কোনো নামে হয়ত অভিহিত হবে সে। এই 'চিরদিনের সেই আমি' আসলে বিবর্তনের ধারায় প্রবহমাণ প্রাণপরম্পরারই প্রতিভূ।

চিত্রা কাব্যের'সন্ধ্যা' কবিতাটিতে বিশ্ববিবর্তনের ধারায় নীহারিকার (nebula) মধ্যে সৌরজগতের সৃষ্টি, তারপর পৃথিবীর প্রাণপ্রাচুর্যময় হয়ে ওঠা ও জীবজগতে নৈসর্গিক নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্যতম প্রাণীর টিকে থাকার একটি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। পৃথিবীতে কত জীব জন্মায়! এদের সবাই টিকে থাকে না। পরিবেশের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করেই প্রাণীকে টিকে থাকতে হয়। এই সংগ্রামে যারা জেতে তারা টিকে থাকে; যারা হেরে যায় তারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এক সময় অতিকায় ডাইনোসররা পৃথিবীতে রাজত্ব করত; কিন্তু আজ তারা নেই, বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। এমনই আরও কত প্রাণী পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে তার যেন শেষ নেই। নিজের পরিবেশ যেন প্রাণীর জন্য একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এই কবিতায় বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরছেন রবীন্দ্রনাথ :

ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ননিমেষে
কত যুগ-যুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীবজীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্যনীহারিকা;
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা;
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব – কত দঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।
['সন্ধ্যা' : *চিত্রা*]

এখানে 'বাল্যনীহারিকা' হচ্ছে শীতল অবস্থার গ্যাস ও ধুলোর সেই প্রকাণ্ড মেঘ, যার গ্যাস ও ধুলো জমাট বেঁধে 'প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা' অর্থাৎ সূর্যের জন্ম হয়েছে; 'স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়' হচ্ছে সাগর-মহসাগর ও সবুজ অরণ্যবেষ্টিত পৃথিবী, প্রাণিকুলের নিকট যা জননীর মতো; দুঃখ, ক্লেশ ও যুদ্ধ হচ্ছে প্রাণীর টিকে থাকার জন্য পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম এবং মৃত্যু হচ্ছে পৃথিবী থেকে তার বিলুপ্তি। এই কবিতাংশটির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (২০১১ : ৩২) বেশ সুন্দর মন্তব্য করেছেন :

> কবি এখানে বস্তুসৃষ্টির আদিতম পর্ব থেকে জীব-সৃষ্টির উত্তরতম পর্ব পর্যন্ত এক নিশ্বাসে ঘুরে এসেছেন। এই মানস পরিক্রমায় struggle for existence বা জীবন-সংগ্রামের কথাটিও বাদ যায়নি। 'কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।' সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট। তত্ত্বের ভার নেই, কিন্তু সারটুকু আছে।

রবীন্দ্রকাব্যে 'জীবনদেবতা' অভিধায় একটি ধারণা আছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবি জীবনদেবতার কথা বলেছেন। এটা কল্প বা অধ্যাত্মলোকের কোনো দেবতা নয়, এটা আসলে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে বিচিত্র ধারায় বয়ে চলা অনন্ত জীবনসত্তা। এই অনন্ত জীবনসত্তাকেই কবি 'দেবতা' অভিধায় অভিহিত করেছেন। এই দেবতা রচনা করে চলেছেন তাঁর জীবনকে। *আত্মপরিচয়* (১৩৫০) গ্রন্থে কবি নিজে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

> এই-যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। ... আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন — [রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ১৩৯-৪০]

চিত্রা কাব্যে এই নামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি শেষ হয়েছে কবির 'চিরপুরাতন' প্রাণসত্তার নতুন সম্পর্কে উপনীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে :

> ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
> আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
> নূতন করিয়া লহো আরবার
> চিরপুরাতন মোরে।
> নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
> নবীন জীবনডোরে।
> ['জীবনদেবতা' : *চিত্রা*]

আত্মপরিচয়ে কবি এ কবিতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

> নিজের জীবনের মধ্যে এই-যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে — যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম। [রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ১৪৩]

আবদুল্লাহ আল-মুতী (১৯৮৭) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে জীবনদেবতার কথা বলেছেন তা নিছক কল্পলোকের বা অধ্যাত্মজগতের দেবতা নয়, তাকে বিবর্তনবাদের আলোকধারায় স্নাত প্রাণপরম্পরারই প্রতিভূ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জন্মদিনের ৫ সংখ্যক কবিতাটিতে রয়েছে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ এবং বিবর্তনের ধারায় মানুষের আবির্ভাবের এক নান্দনিক বর্ণনা। 'মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো' মানবসত্তা প্রথমে উত্থিত হয়েছিল লক্ষ-কোটি নক্ষত্রের যেখানে 'জ্যোতির বন্যাধারা' ছোটে সেই অনন্ত আকাশে। তখন মানবসত্তা সুপ্ত ছিল চেতনাবিহীন শুধুই হাইড্রোজেনের পরমাণুরূপে। কোটি কোটি বছর পূর্বেকার সেই অবস্থা স্মরণ করে কবি বিস্ময় বোধ করছেন :

> জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
> এ বিস্ময় মনে আজ জাগে —
> লক্ষ কোটি নক্ষত্রের

অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
[৫ সংখ্যক কবিতা : *জন্মদিনে*]

তারপর কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে কোনো নক্ষত্রের বুকে হাইড্রোজেন পুড়ে তৈরি হলো হিলিয়াম (helium); কোনো নবতারা (nova) বা অতিনবতারার (supernova) বুকে সেই হিলিয়ামও পুড়ে তৈরি হলো ভারী ভারী মৌল; সৌরজগতের জন্মের সময় সেগুলো জমা হলো পৃথিবীর বুকে। আদিম সমুদ্রে একদিন এল প্রাণ। সেই ক্ষুদ্র প্রাণকণিকা বিকশিত হয়ে উঠে এল ডাঙায়, শাখায়িত হলো নানা রূপে :

এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
[৫ সংখ্যক কবিতা : *জন্মদিনে*]

সমুদ্র ছেড়ে প্রাণের ডাঙায় উঠে আসার পর বহু কোটি বছর রাজত্ব করল বিশালকায় সব প্রাণী। তারা বনাঞ্চল কাঁপিয়ে বেড়াল, আকাশে উড়ল। তারপর, আজ থেকে মাত্রই তিরিশ কি চল্লিশ লাখ বছর আগে, আফ্রিকায়, কিছু ক্ষুদ্র বৃক্ষবাসী প্রাণী ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল, এক সময় তারা দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, আগুন জ্বালাতে শিখল, অন্য প্রাণীদের বশ করল, শিখে নিল ভাষার ব্যবহার, লিখল কবিতা, গড়ল সভ্যতা :

অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে;
[৫ সংখ্যক কবিতা : *জন্মদিনে*]

বিবর্তনের নাট্যশালায় কবি নিজেও একজন অভিনেতা। আলোর পথের যাত্রী তিনিও, এবং এটা তাঁর এক 'পরম বিস্ময়' :

নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
... ...
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে

অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যে ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা —
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারও আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
[৫ সংখ্যক কবিতা : *জন্মদিনে*]

এখানে বিজ্ঞান আর কাব্য যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। যদিও কবিতার জন্য বিজ্ঞান অপরিহার্য নয়, কিন্তু এখানে অলংকার হয়ে তা যেন শোভা বাড়িয়েছে কবিতার। বিজ্ঞান এখানে চাঁদ-ফুল-পাখি-প্রজাপতি, প্রকৃতি-নদী-নারী, প্রেম-ঈশ্বর ইত্যাদি অন্য দশটি প্রসঙ্গের মতোই এক সহজ, স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। ফুলের পাপড়িতে সৌরভ যেমন লীন হয়ে থাকে, বিজ্ঞান এখানে তেমনই লীন হয়ে আছে।

ষোলো শতকের মধ্যভাগে কোপারনিকাস (Nicholas Copernicus, ১৪৭৩-১৫৪৩) তাত্ত্বিকভাবে পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিয়ে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন উনিশ শতকে ডারউইনের হাতে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। কোপারনিকাস থেকে শুরু করে গ্যালিলিও (Galileo Galilei, ১৫৬৪-১৬৪২), নিউটন (Sir Isaac Newton, ১৬৪২-১৭২৭) প্রমুখ বিজ্ঞানী আমাদের শিখিয়েছিলেন, এই মহাবিশ্ব নৈসর্গিক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আমরা তখনও জানতাম, আমরা — মানুষেরা — বুঝি প্রাণিজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে আছি; আমরা বিশেষ, আমরা শ্রেষ্ঠ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিবর্তনের তত্ত্বের মাধ্যমে ডারউইন মানুষকে জীবজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিয়ে নিয়ে গেলেন অন্য সব সাধারণ প্রাণীর কাতারে। তিনি বললেন, মানুষসহ সকল প্রাণীই নিসর্গের অংশ। নৈসর্গিক নিয়মেই তাদের উদ্ভব ও বিকাশ। জীবজগতে প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি সম্পর্কিত ডারউইনের এই বৈপ্লবিক তত্ত্ব, নিউটন এবং আইনস্টাইনের তত্ত্বের মতোই, গভীর অভিনিবেশসহকারে আত্মস্থ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ কারণে তাঁর রচনার প্রায় সকল শাখাতেই (কেবল উপন্যাস ছাড়া), কোনো না কোনোভাবে স্থান পেয়েছে এই তত্ত্ব।

টীকা

১. এই গ্রন্থে ডারউইন দেখান যে, পৃথিবীতে কোনো প্রজাতিই আলাদাভাবে সৃষ্টি হয়নি, বরং প্রাণের একটি সরল রূপ থেকে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অন্য জটিল রূপগুলির উদ্ভব ঘটেছে। বের হওয়ার প্রথম দিনই বইটির সকল (১২৫০) কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তারপর বারবার ছাপা হয়েছে এই বই, আজও ছাপা হচ্ছে।

২. এই তত্ত্বের মূল কথাগুলো হচ্ছে : (ক) সমস্ত গতিবেগ পর্যবেক্ষকের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, (খ) কিন্তু আলোর গতিবেগ তার উৎস ও পর্যবেক্ষকের গতিবেগের ওপর নির্ভর করে না, (গ) বস্তুর ভর তার গতিবেগ অনুযায়ী বাড়ে বা কমে, (ঘ) ভর ও শক্তি পরস্পর রূপান্তরযোগ্য; এদের সম্পর্ক হচ্ছে : শক্তি = ভর × আলোর বেগের বর্গ, (ঙ) দেশ ও কাল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং এদের মান পর্যবেক্ষকের গতিবেগের ওপর নির্ভর করে; গতিবেগ বাড়লে দেশ সংকুচিত ও কাল প্রসারিত হয়, (চ) বস্তুর উপস্থিতি দেশকালকে সমতলে না রেখে বাঁকিয়ে দেয়, আর এ থেকেই মহাকর্ষের উদ্ভব ঘটে।

৩. হাবল দেখতে পান, প্রতিটি গ্যালাক্সি অন্য গ্যালাক্সি থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে। তার মানে, মহাবিশ্ব আয়তনে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

৪. ১৮৯১-৯২ সালে ইনদোনেশিয়ার জাভা থেকে আবিষ্কৃত হয় জাভা মানুষের (Javanensis) ফসিল, ১৯২৭ সালে চিনের পিকিং (বর্তমানে বেইজিং) থেকে পাওয়া গেছে পিকিং মানুষকে (Pekinensis), ১৮৫৬ সালে নিয়ানডারথাল মানুষ (Neanderthal Man) আবিষ্কৃত হয় জারমানির নিয়ানডারথাল গিরিপথের একটি গুহা থেকে আর ১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের দরদোন অঞ্চলে পাওয়া যায় ক্রো-ম্যাগনন মানুষের (Cro-Magnon Man) ফসিল। পরবর্তী সময়ে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার আরও নানা অঞ্চল থেকে এ সব মানুষের প্রচুর ফসিল আবিষ্কৃত হয়।

৫. সুইডিশ প্রাণিবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus, ১৭০৭-১৭৭৮) প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের দুরূহ কাজটি প্রথম সম্পন্ন করেন ১৭৩৫ সালে।

৬. অবশ্য *গল্পগুচ্ছের* 'বলাই' গল্পেও জীবজগতের সৃষ্টি এবং জীবনের প্রবহমাণতার প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু তাতে বিবর্তনবাদ সরাসরি আসেনি বলে এই প্রবন্ধে আমরা গল্পটিকে স্থান দিইনি।

৭. প্রজাতির যোগ্যতম সদস্যটিই জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়। ডারউইনের তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer, ১৮২০-১৯০৩) এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

অমল দাশগুপ্ত (১৯৮৫)। *প্রাণের ইতিবৃত্ত*, লেখাপড়া, কলকাতা।

আবদুল্লাহ আল-মুতী (১৯৮৭)। *বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪০৬)। *রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

প্রমথনাথ বিশী (১৩৯৬)। *রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১০)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৮)। *চিঠিপত্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

সুব্রত বড়ুয়া (২০১১)। *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (২০১১) *রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক বিজ্ঞান*, কথারূপ, কলকাতা।

Carl Sagan (1985). *Cosmos*, Ballantine Books.

Charles Darwin (2004).*The Descent of Man*, Penguin Books.

Stephen Hawking (2001).*The Universe in a Nutshell*. London, Bantam Press.